International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-XI, December 2016, Page No. 37-45
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www,irjims,com

কালকূট ও বাংলা সাহিত্য

শ্রীতম মজুমদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

Abstract

During 50's to 80's of 20th Century, 'Kalkut' (Samaresh Basu) was a prominent literary figure in Bengali Literature, As he earned his livelihood by writing and wrote more than 40 literary pieces including those were written under the name 'Kalkut', the meaning of the word 'Kalkut' is "life taking poison', Samaresh and Kalkut were the same person its like two personas are imbibed within one and writing in two different directions, going by the popularity Kalkut was more appreciated by the readers than Samaresh's writing, Kalkut brought a great deal of diversity in respect of subject and plot of his writings and included the experiences of rural life as well as urban life, He was deeply influenced by the mythologies and the serenity of forestland felt strong compassion for forest life, Moreover Kalkut was a story teller of carefree 'Baul' soul and his writings became the one string instrument of a Baul soul,

সুনীল গাঙ্গুলী 'কালকূট'কে নিয়ে কয়েকটি কথা' বলতে গিয়ে বলেন, 'কালকূট' তো একটা ছদ্মনাম। কালকূটের একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে। তার রচনার ভঙ্গীটিও সমরেশ বসুর থেকে অনেকটা আলাদা। একই সঙ্গে দু'রকম লেখা চালিয়ে যাওয়া শক্ত, কিন্তু কালকূটের লেখা এক কথায় বলা যায় অনবদ্য।'

কালকূট' আমাদের ঠিক এক দশক আগের লেখক। আমরা যখন কলেজে পড়ি, তখনই তিনি উদীয়মান তরুণ লেখক। 'দেশ' পত্রিকায় কালকূট নামে ধারাবাহিক উপন্যাস 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' প্রকাশের পরই তরুণ লেখক সমরেশ বসু হয়ে গেলেন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক।"[১] (গঙ্গোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা: ১)

পিতৃদত্ত নাম সুরথনাথ বসু। বন্ধু দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় সে নাম বদলে নাম দিলেন 'সমরেশ বসু'। তারপর থেকে সাহিত্যক্ষেত্রে 'সমরেশ' নামেই সুরথনাথের পথ চলা শুরু। কথা সাহিত্যিক সমরেশ বসুরই ছদ্মনাম 'কালকূট'। সমরেশ ও কালকূট একই মানুষ। একই কয়েনের দুই পিঠ। এ পিঠ সমরেশ তো ও পিঠ কালকূট। একই সময়ে একই ব্যক্তি একই কলমে দুই রকম লেখা লিখে যাচ্ছেন। এটা রীতিমতো আশ্চর্যজনক! সত্যজিৎ চৌধুরী জানাচ্ছেন,

> *"কালকূটের বয়ানেও সেই মানব-অন্বেষা, সেই শুদ্ধ মনুষ্যত্বের নজির খুঁজে ফেরা মূল প্রসঙ্গ। দেখার দৃষ্টির, উপলব্ধির ঐক্যসূত্রে সমরেশ আর কালকূটের লেখা যে গভীরে চোখ রেখে বহে চলে -অনুভব করতে পারি। আর এই কারণেই দুই রচনার দুই পৃথক কণ্ঠস্বর বাজে -মেনে নিতে বাধে।"[২] (চৌধুরী, পৃষ্ঠা: ১৮)*

একজন লেখককে তাঁর লেখনীর মধ্যেই ধরা যায়। তাঁর একটা বাঁধা গজ থাকে। সেই ছক ধরেই অনুমিত হয় যে এটা এনার লেখা, ওটা ওনার লেখা। কিন্তু কালকূটের কলম কখনই সমরেশের কলম ধরেনি বা সমরেশের লেখার পাতায় কলম ঘষেনি। পাঠক মহলে একথাও স্বীকৃত যে সমরেশের লেখার থেকে কালকূটের লেখনী সাধারণ পাঠকের কাছে অনেক বেশি জনপ্রিয়। 'কালকূট' ছদ্মনামে সমরেশের মোট লেখা মোটেই কম নয়। প্রায় চল্লিশটি বৃহৎ কর্মকাণ্ডের স্রষ্টা কথাকার কালকূট।

স্বনামের লেখক যখন ছদ্মনামে লেখেন তখন কোথাও না কোথাও একটা ঝুঁকি থেকেই যায়। সবথেকে বড় প্রশ্ন, পাঠক কীভাবে নেবে! এই প্রসঙ্গে বলা যায়, এই চিন্তার অবসান ঘটিয়ে কালকূটের রচনা (উপন্যাস) এক স্বতন্ত্র ধারায় বাংলা উপন্যাসের জগতে গৃহীত হয়েছে। 'কালকূটের রচনা' বিষয় ও ভাবনার আঙ্গিকে পাঠকের মন কেড়েছে। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখকের অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে প্রধান ও অন্যতম। এই দ্বৈতসত্তা প্রসঙ্গে বলেছেন, "অনেক সময় মনে হয় কালকূট ও সমরেশ যেন পরস্পরের পরিপূরক। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ফিরে যে অভিজ্ঞতা সে অর্জন করেছে 'কালকূট' হিসেবে তাকেই সে বিবৃত করেছে। আবার সেই অভিজ্ঞতাকে কল্পনার জারক রসে মিশিয়ে, জিজ্ঞাসায় শানিত করে উপন্যাসে পরিণত করেছে যে সে 'সমরেশ'। লোকটা দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। এক সমরেশ সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন, আরেকজন হল বাউল। সামাজিক সমরেশ যে কত লোকের দায়িত্ব নিত বলে শেষ করা যাবে না। ...এটা কালকূট করেনি। সে মাঝে মধ্যেই পালাতে চাইত-সব ফেলে, সব ছেড়ে।"[৩] (বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা: ১৯) সমরেশ এবং কালকূটের মধ্যে ফারাকটা কোথায়! তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। জীবন অভিজ্ঞতায়, লেখার ধরণে।

"কার আজ্ঞায় কে বা রাখে নাম। নাম, কালকূট। অর্থ যার তীব্র বিষ। মনে করতে পারছি না, কেউ মুখে আঁচল চেপে বলেছিল কী না, কী নামের ছববা! ভেবেছিলাম আমিও। অমিয় অমৃত সুধা। কিছু এলো না মনে, এলো তো, একেবারে সংসার ছাড়া নাম, মহা হলাহল। আজ্ঞাটা যে কার, আমি নিজেও জানি না।"[৪] (কালকূট, পৃষ্ঠা: ৩৯) ছদ্মনামের প্রয়োজন তখনই হয় যখন নিজেকে (নিজেকে নামকে) আড়াল করার প্রয়োজন (সময়) আসে। অনেকসময় অনেক কিছু বলার থাকে অথচ সর্বসমক্ষে সেকথা বলা দায় হয়ে ওঠে। আবার, মনের কথা উজাড় করে দিলে পারিপার্শ্বিক বিপদ বাড়তে পারে। কারণ মুখ (জিভ) তো কথাটি বলে খালাস, ভিতরে ঢুকে যাবে। কিল চড় চাপড় তো পিঠকেই সহ্য করতে হবে। সে ঝুঁকি নেওয়া ভীষণ মারাত্মক। তাই এই আড়াল-আবডাল। কালকূট! ছদ্মনাম! বেশ, তবে এমন নাম কেন! যার অর্থ গরল। পাঠকের তথা শ্রোতার কৌতূহল হয়।

১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দ। শহর কলকাতা থেকে কিছুটা দূরে। নৈহাটি উপকণ্ঠ। সমরেশ তখন রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। রাজ্য জুড়ে চলছে ভোটরঙ্গের খেলা। সবে পিতৃবিয়োগ ঘটেছে সমরেশের। ঘাট কামানো করে ১২দিনের দিন ব্যারাকপুরের শিল্পাঞ্চলের ওপর দিয়ে বাসে চেপে যাচ্ছিলেন। সেসময় আগের কোন এক ঘটনার বদলা নিতে কংগ্রেসের একটা মিছিল লাঠিসোটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাসের উপর। শুরু করল বেধড়ক মার। পুরুষ-নারী-শিশু-বয়স্ক কাউকে ছেড়ে কথা নয়। মদের ঘোরে থাকা এক আক্রমণকারী সমরেশকে টেনে নামাতেই সমরেশ জিজ্ঞেস করেছিল "ক্যা হুয়া?' ধুতি পাঞ্জাবি ন্যাড়া মাথায় টিকি, তার ওপর এক জবান, 'ক্যা হুয়া'-তেই মুক্তি!"[৫] (কালকূট, পৃষ্ঠা: ৪০) অবাঙালি বলে নির্ঘাত সে যাত্রায় সমরেশ রক্ষে পেয়েছিল। সমরেশ জানাচ্ছেন,

> *"সেই ঘটনাই তখন লিখেছিলাম, ছদ্মনামের আড়ালে নিয়ে। ...কালকূটের উদ্ভব সেই প্রথম রাজনৈতিক রচনায়, আর সেই শেষ। অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। নিজের নামের অর্থটা তখনো নিজের কাছে ধরা পড়েনি। কারণ সেই লেখাটা ভুলতে বেশী সময় লাগে নি।"[৬] (কালকূট, পৃষ্ঠা: ৪০-৪১)*

কালকূটের 'ভোটদর্পণ' রচনাটিতে রাজনীতির এক চাপা সুর ছিল। তৎকালীন রাজনীতিমূলক লেখা স্বভাবতই আড়াল অবশ্যম্ভাবী। কালকূটের কলমে রাজনৈতিক লেখা হিসেবে 'ভোটদর্পণ'ই প্রথম ও শেষ লেখা। পুরাণমতে

সমুদ্রমন্থনকালে যে হলাহল উঠেছিল, বিশ্বসংসারকে সেই গরলের দুস্প্রভাব থেকে বাঁচাতে মহাদেব তা পান করেন, নাম হয় নীলকণ্ঠ। বর্তমান সময়ে সমাজ রাজনীতির যে কুটিল রূপ, যে কলুষিত বাতাবরণ -এহেন অসহনীয় পরিস্থিতিতে মানুষের মনে বিশ্বাসহীনতার যে গরল (অসহিষ্ণুতা) উৎপন্ন হচ্ছে, সে গরল উদ্গীরনের (ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ) থেকে পান করাই (নিজের অন্তরেই রেখে) শ্রেয় বলে কালকূট মনে করেছেন এবং বিষাক্ত গরল পান (বিশ্বাসকে অক্ষুণ্ন রেখে) করে কালকূট নীলকণ্ঠের মতো হতে চেয়েছেন। 'ভোটদর্পণ' রচনার সময়ে যে বিষাক্ত পরিমণ্ডল তিনি প্রত্যক্ষণ করেছিলেন, সেই অবস্থাকে মাথায় রেখেই সমরেশের 'কালকূট' নাম গ্রহণ। অশনি পত্রিকা' কালকূটের এক সাক্ষাৎকার ছেপেছিল। সেখানে কালকূট জানাচ্ছেন, "তখন সবে জেল থেকে বেরিয়েছি। ছদ্মনামের খুব দরকার ছিল। কালকূট, হলাহল, এটা খানিকটা যেন আমার নিজেরই ভিতরের ব্যাপার।"[৭] (বসু, পৃষ্ঠা:)

বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে মানুষটা ভিতরের একটা যন্ত্রণা কাজ করছিল। মন মধ্যে এক অস্থিরতা ছিল। শাসক দলের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন তাই নামকে গোপন রাখা দরকার ছিল। অঙ্গে বিষ নিয়ে তিনি অমৃতের খোঁজে ঘুরে ফিরেছেন। তাঁর 'গাহে অচিন পাখি' রচনাতেই সমরেশের কালকূট হয়ে ওঠার (নাম গ্রহণ) উল্লেখ তিনি নিজেই করেছেন।

> *"কিন্তু এমন নামটি কেন? তা হলে যে প্রাণটি খুলে দেখাতে হয়। দেখলেই বোঝা যাবে, বুক ভরে আছে গরলে, আপনাকে খুঁজে ফেরা, আসলে তো হা অমৃত হা অমৃত! বিষে অঙ্গ জরজর, কোথা হা অমৃত!... কালকূট ছাড়া, আমার আর কী নাম হতে পারে?"[৮] (কালকূট, পৃষ্ঠা: ৪০)*

দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ এবং দপ্তরীর বিখ্যাত ব্যক্তি কানাইলাল সরকারের সহযোগিতায় আনন্দবাজার পত্রিকায় কুম্ভমেলার রিপোর্ট লেখার কাজে পেয়ে তিনি এলেন এলাহবাদ। কবি অরুণ মিত্রের কাছে। 'কালকূট' নামে লিখতে চেয়ে সাগরময় ঘোষকে বললেন, "যদি আমার বিষবাহী প্রাণের অমৃত সন্ধানের কোথা দেশ পত্রিকাতে একটু বিস্তৃত করে লেখবার অনুমতি করে দেন।"[৯] (কালকূট, পৃষ্ঠা: ৪৮) এরপর কানাইলাল সরকারের কানে সাগরবাবু কথাটা পাড়লে বলেন, "লিখুন আপনি। যত তাড়াতাড়ি আরম্ভ করতে পারেন, তাই করুন। ছদ্মনামে লিখতে চান? তাই লিখুন।"[১০] (কালকূট, পৃষ্ঠা: ৪৮)

ব্যস, এই অভয় বাণী শোনার পর "শুরু হল যাত্রা, 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'। কালকূট তাঁর নামের সংজ্ঞার্থ খুঁজে পাচ্ছে।"[১১] (কালকূট, পৃষ্ঠা: ৪৯)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কালকূটের লেখাগুলোকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন, "কালকূট রচনা সমগ্র'কে শ্রেণী বিচারে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক, তীর্থ পরিক্রমা, যথা, 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে', 'নির্জন সৈকতে' প্রভৃতি। দুই, জানপদ অভিজ্ঞতা, 'স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গণে', 'আরব সাগরের জল লোনা' প্রভৃতি। তিন, বিচিত্রের সন্ধান, যথা, 'মন চলো বনে', 'বনের সঙ্গে খেলা।"[১২] (বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা: ঘ)

'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' প্রকাশিত হতে থাকলে লেখাটি পাঠক মহলে খুব গ্রহণযোগ্য হয়। এরপর ১৯৫৪র নভেম্বর মাসে 'বেঙ্গল পাবলিশার্স' থেকে প্রথম বই আকারে বের হয়। খুব তাড়াতাড়ি 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে'র প্রথম মূদ্রণ শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয় মূদ্রণকালে উপন্যাসটির শুরুর শুরুতেই কালকূট 'বিচিত্র' নামের এই সংযোজনী লেখেন।

> *"অনেক বিচিত্রের মধ্যে মানুষের চেয়ে বিচিত্র তো আর কোনদিন কিছু দেখিনি। সে বিচিত্রের মধ্যেই আমার অপরূপের দর্শন ঘটেছে। সব মানুষই একজন নন। আর একজন আছেন তাঁর মধ্যে। একজন যিনি কাজ করেন; বাঁচবার জন্য গলদঘর্ম দিবানিশি। যিনি আহার মৈথুন সন্তানপালনের মহান কর্তব্যে ব্যাপৃত প্রায় সর্বক্ষণ, এই জটিল সংসারে যাঁর অনেক সংশয়, ভয় প্রতি পদে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, বিবাদ এইসব নিয়ে যে মানুষ, তাঁর মধ্যে আছেন আর একজন- তিনি কবি, সাহিত্যিক, পাঠক, শিল্পী, গায়ক, ভাবুক।*

এককথায় যিনি রসপিপাসু।... মানুষের এই অনুভূতির তীব্রক্ষণে সে বড় একলা। এ একাকীত্বের বেদনা যত গভীর, আনন্দ তেমনি তীব্র।”[১৩] (কালকূট, পৃষ্ঠা: ৭)

সর্বভারতীয় মেলার প্রাঙ্গনে রচিত **‘অমৃত কুম্ভের সন্ধানে’** (১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ) উপন্যাসটিতে লেখক পৌঁছেছেন প্রয়াগের কুম্ভমেলাতে। ‘মহামানবের সাগরতীরে’ এসেই কালকূটের প্রকৃত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। “লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি ধর্মান্ধ হয়, তবে খুঁজেই দেখি না কেন, লক্ষ মনের কোন চোখে পরানো আছে সেই ঠুলি!”[১৪] (কালকূট, পৃষ্ঠা: ১২) এই একটা আগ্রহ বোধ করি এসেই পড়ে। কালকূটেরও এসেছে। তাই তিনি মেলামুখী হয়েছেন। “ধর্মান্ধ কিনা জানিনে। তবে মানুষ দেখতে যাচ্ছি। আমাদের সব কিছুতে সাধ মিটতে পারে! সাধ মেটে না মানুষ দেখে, মানুষ চেখে! মানুষের চেয়ে বিচিত্র এ সংসারে আর কী আছে?”[১৫] (কালকূট, পৃষ্ঠা: ১২-১৩) সারা ভারতবর্ষ থেকে কত রকমের মানুষের আগম ঘটেছে এই কুম্ভমেলায়। কত শত ধর্মের মানুষ; বাউল, বৈষ্ণব, তন্ত্রসাধক, নারী পুরুষ সাধারণ মানুষ সব এসে মিলেছে মিলনমেলায়। বহু ধর্মের বহু মানুষ এসেছেন ধর্ম করতে। আর কালকূট এসেছেন মানুষ দেখতে। বিভিন্ন মানুষের মাঝে তিনি নিজেকেই যেন খুঁজে ফিরেছেন। অমৃতের সন্ধান করা শুধু প্রয়াগের কুম্ভেই নয়, মনের কুম্ভেও। বাউলের সুরে তাই কালকূটও বলেন,

“আমি একদিনও দেখিলাম না তারে/ আমার ঘরের কাছে আরশীনগর এক পড়শী বসত করে।’... গানখানি যে অর্থে লালন গেয়েছিলেন, বলতে গেলে একদিক থেকে আমারও সেই অর্থেই স্মরণ। আসলে তো আরশী নগরটি তাঁর আপন দেহ। পড়শীটি হলেন তাঁর সাধক সত্তা। ... কিন্তু আমি তো আর সাধক না। অতএব বলি, নামের আড়ালে থেকে নিজেকে ব্যক্ত করা কথাটা তেমন যুতসই লাগছে না। বরং, আমার আরশীনগর যদি হয় জগত ও জগতজন, তাদের মধ্যে আমার পড়শী সত্তাটিকে সন্ধানই নামের আড়ালে ঘুরে ফেরা।”[১৬] (কালকূট, পৃষ্ঠা: ৩৯) উপন্যাসে তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা বৃদ্ধের যুবতী বউ শ্যামার মন মধ্যে বেদনা কালকূটকে ভাবিয়েছে। ‘মা খেগো বলা’ অর্থাৎ বলরাম ও লক্ষ্মীদাসীর গানের কথা ও সুর, তাদের অস্তিত্ব টিকিকে রাখার কাহিনি। ভূতানন্দ এবং তাঁর সঙ্গিনী ভৈরবীর টক-ঝাল-মিষ্টি সম্পর্ক, তন্ত্র সাধনার প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্বের আভাস উপন্যাসে পাওয়া যায়। কালকূট দেখলেন তীর্থে আসা মানুষগুলোর বিচিত্র ভক্তি। সন্যাসীর কাছে জানলেন, প্রেম কী জিনিস! গৃহী ও সন্ন্যাসীর পার্থক্য কোথায়! তীর্থে আসা সাধিকা রামাদাসীজি (ইনি আগে মনিয়াবাঈ ছিলেন, পড়ে দীক্ষা নেন) অতীত জীবনের সুখ-দুঃখময় কথা কালকূটকে বলেন। এরকম এমন কত মানুষ আছেন বা এসেছেন এই মেলায় যাদের কথা কালকূটের শোনা হয়নি। লেখক দেখছেন, পরম পুরুষকে পাওয়ার আশায় মানুষ ছুটছে। জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে কালকূটের কাছে বিচিত্র এই মানুষই হয়ে উঠেছে ভারততীর্থ।

কেন্দুলির জয়দেবের মেলাকে কেন্দ্র করে **‘খুঁজে ফিরি সেই মানুষে’** ছোট্ট একটি রচনা। এই লেখারই বড় ভার্সান **‘কোথায় পাবো তারে’**। অসাধারণ এই উপন্যাসখানির নাম শুনেই বোঝা যায় কালকূটের বাউল ভাবনার কদর। মেলায় আগত বাউল-ফকিরদের মুখে কালকূট শুনেছে সন্ন্যাসী গৃহী বাউলদের চরম দারিদ্র্যের কথা, ভিক্ষে করে দিন যাপনের কথা, তাদের ধর্ম ও ইতিহাসের কথা। **‘অমাবস্যায় চাঁদের উদয়’**- এই উপন্যাসটি বাউল গানের নামে হলেও মূল তত্ত্বটি তন্ত্র সাধনার উপরেই প্রাধান্য পেয়েছে। কামরূপ কামাখ্যায় যে তন্ত্র সাধনা তান্ত্রিকরা করে থাকেন। তবে অমাবস্যায় চাঁদের উদয় কী প্রকারে সম্ভব! উপন্যাসের পবিত্র মা বলেছেন কালকূটকে,

“...একটা তত্ত্ব আছে, তত্ত্বটা জানা থাকা চাই। ...ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেরও একটা তত্ত্ব আছে। ...এই ভাণ্ডই যে ব্রহ্মাণ্ড, তা বোঝাবার একটা তত্ত্ব আছে, সেই তত্ত্ব যে সাধে সে তা বুঝতে পারে। সবাই পারে না।... এমনই সাধনা, যা সাধলে অমাবস্যায় চাঁদের উদয় হয়।”[১৭] (কালকূট, পৃষ্ঠা: ১৩৭৬) সাধনার কালে সাধক মিলিত হয় প্রকৃতির (নারী) সঙ্গে। এটাই হল সাধনা পথের গুপ্ত সিঁড়ি। এই মিলনে বিন্দুধারণ অতি প্রয়োজনীয়। উপন্যাসটিতে সাবিত্রী মা, জগত মা, প্রাণতোষ বাবার মতো প্রভৃতি চরিত্রের আনাগোনায় তন্ত্র সাধনার খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ কালকূট ব্যক্ত করেছেন।

প্রয়াগ থেকে যাত্রা এবারে ত্রিবেণী সঙ্গমের দিকে। বাংলার হুগলী জেলার ত্রিবেণী। **'মুক্ত বেণীর উজানে'**। এরূপ নামকরণের জিজ্ঞাসা কালকূটই নিরসন করেছেন। "গঙ্গা সরস্বতীর সঙ্গম...। কিছুটা দক্ষিণে গেলে যমুনার মরা গাঙ দেখা যায়। ত্রিবেণীর সঙ্গম নিঃসন্দেহে এখানে গুপ্ত নন, যেমন আছেন প্রয়াগ সঙ্গমে। প্রয়াগ হলো গুপ্ত বেণী। বাঙলার ত্রিবেণী মুক্ত বেণী। তারও অবিশ্যি ব্যাখ্যা আছে। প্রয়াগে তিন ধারার মিলন ঘটেছে, এখানে এসে ছাড়াছাড়ি। এখানে এসে তিন কন্যার তিন দিকে পৃথক ধারায় যাত্রা।"[১৮] (কালকূট, পৃষ্ঠা: ২২৫৪) এখানে তিনি শ্যামা ক্ষ্যাপার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। সে অনাথ ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছে। তাদের বিয়ে থা দিয়েছে। সে অর্থে শ্যামা ক্ষ্যাপা পিতা না হয়েও পিতা। এখন সব ছেড়ে-ছুড়ে সাধনভজনে নিজেকে খুঁজছেন। উপন্যাসে গঙ্গা ও যমুনা নামের নারী চরিত্রের দ্বারাও কালকূট প্রভাবিত হয়েছে। যমুনার কথায় 'নিজেকে চিনতে পারিনি, তাঁকে চিনব কেমন করে? জীবনটা সকলের একরকম নয়।'[১৯] (কালকূট, পৃষ্ঠা: ২৩৪৫) এরপর কালকূট চলেছেন ডমুরদহের পথে। এ যাত্রার নাম **'চলো মন রূপনগরে'**। উপন্যাসে মানুষের বহু রূপের মধ্যে অরূপের লীলাকে খুঁজতে আগ্রহী হয়েছেন কালকূট। কোথায় খুঁজেছেন! পথে-ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে, যত্রে-তত্রে। কালকূটের মনে প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে, 'রূপের এই ধারাবাহিক গতিময়তার মধ্যে অরূপের রূপ কেমন?' সংসারের সাধারণ মানুষকে তিনি বৈরাগী হতে দেখেছেন। হুগলীর শ্রীপুর গ্রামে গোলক দাস বাবাজীর সান্নিধ্যে তিনি বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বকথা শুনেছেন। কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় সতীমায়ের মেলাতে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে **'কোথায় সে জন আছে'** উপন্যাসটিতে। এই মেলায় যাত্রাকালে কালকূটের সঙ্গী ছিলেন কালপেঁচা (বিনয় ঘোষ)। ধর্মের নামে ভণ্ডামির দিকটা লেখক দেখিয়েছেন। বন্ধ্যা মেয়েদের গুরুরা গুরুপ্রসাদীর নাম করে পুণ্যফল দেন। বন্ধ্যা মেয়েরা নাকি সেই প্রসাদীরই কামনা করে। কালকূটের এতে মন ভরে না। সে অবশ্য খুঁজে বেড়ায় সেই জনকে। **'যে খোঁজে আপন ঘরে'** উপন্যাসটিতে বরদাকান্ত মজুমদার ও যুবতী লছমীর না বলা হৃদয় সম্পর্কের মধ্যে অসহায়তা উপলব্ধি করেন। বরদাকান্তর কথায় সংসারে কেউ নিজেকে খোঁজে, কেউ খোঁজে ঈশ্বরকে। যে নিজেকে খোঁজে জগত সংসার তাঁর পানেই চেয়ে থাকে। আসলে নিজেকে খোঁজার অর্থ নিজের ভিতরের অন্ধকারকে খোঁজা। এই সহজ কথাটি রয়েছে এখানে। রাজগীর ও নেপালের ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাস **'বাণীধ্বনি বেণুবনে'**। মাঘ মাসের শীত। নেপালের তরাই অঞ্চল। উদ্দেশ্য রামের বিবাহ উৎসবকে কেন্দ্র করে যে উৎসব হয় সেই তীর্থে সামিল হন কালকূট। উপন্যাসটি সম্পর্কে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, "বস্তুত 'বাণীধ্বনি বেণুবনে' কালকূটের কবি সত্তার পরিচয়কে বহন করছে। অতীতের স্বপ্ন কুহেলীর মাঝখানে নিশিপাওয়া মানুষের মতো মাঝে মাঝে লেখক ঘুরে বেড়িয়েছেন। ... যা বর্তমান কথাসাহিত্যে দুর্লভ। ... জনকপুরের ধীরুমায়া বৃত্ত থেকে রাজগৃহের সোনপাতিয়া বৃত্ত পর্যন্ত একটা খরস্রোত ভেতরে বয়ে চলেছে।"[২০] (বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা: খ) ভট্টাচার্য মশাই, কিশোরী বালা ধীরুমায়া, বাস্তব এবং কল্পনার মিশেলে গড়া সোনপাতিয়ার কাহিনিতে বেণুবন ধ্বনিত হয়েছে। কালকূট ছুটেছেন শোনপুরের হরিহর ছত্রের মেলায়। মানুষের শোনপুরের এই মেলায় তিনি ডুব দিয়ে **'পণ্যভূমে পুণ্যস্নান'** করেছেন। প্রশ্ন জাগে, উপন্যাসের নামটি এমন কেন! অন্যান্য মেলায় মানুষ যায় তীর্থের উদ্দেশ্যে, কিন্তু এই মেলার আয়োজন শুধুমাত্র জিনিশ কেনাবেচার জন্য। পশুপাখি, গাছপালা, অলংকার থেকে যাবতীয় সামগ্রী সবকিছু পণ্য হয় এই ভূমিতে। উপন্যাসে সিং বাহাদুরজীর মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, লাঞ্ছিত কুসুমের যন্ত্রণা, পথের খোঁজে পথ হারা এক বালক পবননন্দন ঝা প্রভৃতির উপস্থিতি উজ্জ্বল। বাস্তব সমাজের পটভূমিতে গ্রামীণ মানুষের বেশ কিছু সুখ দুঃখের ছবি পাওয়া গেছে **'ঘরের কাছে আরশীনগর'** উপন্যাসে। স্বামী পরিত্যক্তা রাণীদির জীবনে সামাজিক চিত্রবাহী দিকটি উদ্ভাসিত হয়েছে। তিনি এখানে সমস্যাটি দেখিয়েছেন, সমস্যা থেকে উত্তরণের হদিশ বাতলে দেননি। গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির দিকটি কালকূট খুব সহজ সরলভাবে দেখিয়েছেন। কালকূটের বিবাগী মন ছুটে গেছে পুরীর **'নির্জন সৈকতে'**। 'মানুষ নামের মদে আমার বড়ই তৃষ্ণা। আকণ্ঠ পান করে আমি নেশা করেছি।' জগন্নাথ দেবের মন্দিরের শিল্পকলায় তিনি জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি দেখেছেন। পরিচয় হয় খেপি, কালাচাঁদ, বিন্দু, মহিম, নিখিল ও রেণুর সঙ্গে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সমুদ্রের বর্ণনা, কোণারকের সূর্যমন্দিরের বর্ণনা দিলেও মানুষের হৃদয়ে

সমুদ্রের যে ঢেউ কালকূট প্রত্যক্ষণ করেছেন তা প্রশংসনীয়। এক বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে **‘ধ্যান জ্ঞান প্রেম’**-এর প্লট। জ্ঞানের পিপাসা মেটাতে গবেষণাগারে আসা ড: ডি, কে, ঘোষ, ড: অমিত মৈত্র, রিসার্চ ফেলো হিরণ প্রভৃতি মানুষজনের মধ্যে থেকে কালকূটের জীবনকে উপভোগ করার বাঞ্ছা প্রকাশিত হয়েছে।

‘ভ্রমণ-বিলাসী কালকূটের ডানায় যখনই কাঁপন লাগত তিনি তখনই ঘর-সংসার, পরিজন- পরিবেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন। তাঁর এই আশৈশব বেরিয়ে পড়া, তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, পুণ্যলোভাতুর বা জ্ঞানান্বেষীদের মতো বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য বা অভিজ্ঞতা আহরণের উপলক্ষ ছিল না। কেন তিনি বারংবার ঘরের বন্ধন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন, কীভাবে তাঁর শিল্পীসত্তায় জড়িয়ে ছিল সমাজ ও সংসার সম্পর্কে অনিঃশেষ নিরাসক্তি, নারী বা প্রকৃতির কাছে কেন তিনি জীবনে কখনও স্থায়ী ঠিকানা খুঁজে পাননি...। কালকূটের ভ্রমণ-বিলাস এমন একটা তত্ত্ব-তালাস ঘিরে, যার কেন্দ্র বিন্দুতে থাকে মানুষ।”[২১] (বসু, পৃষ্ঠা: ৩) **‘স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গণে’** দার্জিলিং ভ্রমণের স্মৃতিকথা নিয়ে লেখা। পাহাড়ের নিসর্গতা কালকূটকে টেনেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার বর্ণনা অভিভূত করেছে। পরমেশ বাবু, কাকলির সাহচর্য তিনি উপভোগ করেছেন। নিসর্গের সঙ্গে তিনি পারিপার্শ্বিক নরনারীদের আচার আচরণের প্রতিও সজাগ ছিলেন। শ্রীমন্ত, ললিতা, শুভেন্দু, প্রেমবতী, সুমিতা, বিবেক ও সুবীর প্রমুখ চরিত্রের সম্পর্কগুলো পাঠককে ভাবিয়ে তোলে। পর্বতের সৌন্দর্য কালকূটকে আবারও আকর্ষণ করেছে। ‘Queens of the Himalaya’র আকর্ষণ কালকূটকে টেনে নিয়ে গিয়েছে **‘তুষার সিংহের পদতলে’**। এখানে শুধুমাত্র পর্বতের মহিমাতেই তিনি সীমাবদ্ধ থাকেননি। কলম ঘষেছেন পর্বতবাসী মানুষগুলির জীবন জীবিকাতেও। মেজর ঘোষাল, তার বোন কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে কালকূটের আলাপ হয়। বিলাস বৈভবের মধ্যে দিন কাটালেও কুন্দনন্দিনীর জীবনের ট্রাজেডি, তার অন্তরের গ্লানির দিকটি দ্রষ্টা কালকূটের নজর থেকে বাদ পড়েনি। **‘আরব সাগরের জল লোনা’** ও **‘অমৃত বিষের পাত্রে’** উপন্যাস দুটি প্রায় সমধর্মী পর্যায়ে লেখা। লেখকের বম্বে (মুম্বাই) ও দিল্লী যাত্রার কথন রয়েছে। মূল চরিত্রে থাকা গোয়ার মেয়ে লিজা এবং দিল্লির মেয়ে রঞ্জিতা রিজভির জীবনে যে ব্যর্থতার লোনাজল বারংবার ঝাপটা দিয়ে সবকিছু তছনছ করে দিয়ে যাচ্ছে সেই জীবন সমস্যায় বর্ণিত হয়েছে এই দুই উপন্যাসে। **‘পিঞ্জরে অচিন পাখি’** উপন্যাসটির মূল বিষয় ‘দগ্ধশুক্র’ যা মূলত জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি আলোচ্য দিক। এই জাতক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিভাধর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রজোগুণী হবেন। অনঙ্গমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এই বৈশিষ্ট্যে সমুজ্বল। ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কিসের দুর্নিবার আকর্ষনে অনঙ্গমোহন বারংবার পতিতালয়ে যায় সে কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে।

> *“আমি সংসারের বেড়াজালের মধ্যে থেকেও পথের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারি না। পাখি যেমন কূলায় ছেড়ে দূরের আকাশে উড়ে যায়, পথের ডাক সেই রকমই আমার মনের পাখায় কাঁপন ধরিয়ে দেয়। একে কেউ যদি জীবনকে ফাঁকি দেওয়া বলে, পলাতক বলতে চায়, বলুক গিয়ে। আমি জানি, জীবনে কোথাও ফাঁকি দিয়ে সংসার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে জীবনে কেউ কোনো মহৎ কাজ করতে পেরেছে বলেও মনে করি না। ...সেই পথের ডাকে আমি ঘর বিবাগী বৈরাগী না, বিশাল জীবনের অঙ্গনে, নিজেকে আর এক রকমের আবিষ্কার। নিজেকেই নতুন করে খুঁজে ফেরা।”[২২] (কালকূট, পৃষ্ঠা: ২৪৬১)*

পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে কালকূট লিখেছেন বেশ কতকগুলি উপন্যাস। কৃষ্ণপুত্র শাম্বের কুষ্ঠরোগের কবলে পড়া এবং সেই রোগের কারণে ব্যক্তিজীবনে পাওয়া আঘাতগুলি থেকে নিরন্তর উত্তরণের প্রয়াসই ‘শাম্ব’ উপন্যাসের মূল কাহিনি। ১৯৮০তে ‘শাম্ব’র জন্যই কালকূট সাহিত্য অকাদেমী পুরস্কার পান। কুন্তীর অসামান্য জীবন কাহিনি নিয়ে কালকূট লিখলেন ‘পৃথা’। ‘আমার সন্ধানের লক্ষ্য এক রাণীর ইতিহাসের পথ’। সামাজিক রীতিনীতিকে লঙ্ঘন করে একজন নারী তার দায়িত্ববোধ ও আত্মসম্মান নিয়ে কিভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারেন, পৃথার সেই জীবনকে সমস্ত রকমের সুখ দুঃখের উর্দ্ধে রেখে কালকূট আকুতি প্রকাশ করেছেন। শম্ভুনাথ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ‘এই হল দুঃখের শরীক আরেক চিরদুঃখিনী মানবীকে অভিবাদন জানানোর প্রতিবেদন’। দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিত্বে

পৌঁছনোর অসাধ্য সাধনের প্রচেষ্টার কথা পরিবেশিত হয়েছে ‘প্রাচেতস’ উপন্যাসে। প্রাচেতস, যিনি রামায়ণ কাহিনির প্রথম রচয়িতা। উপন্যসে স্রষ্টার নিজস্ব উপলব্ধি এবং সেই উপলব্ধির ফলে বিশ্বচরাচরকে নতুন রূপে চেনা অসাধারণ ভাষাশিল্পে উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়াও ‘যুদ্ধের শেষ সেনাপতি’তে কৌরব ও পাণ্ডবদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, সেই সঙ্গে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের রণকৌশল কালকূট নিপূণ লেখনীতে অঙ্কন করেছেন। দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামাই এই উপন্যাসের নায়ক। চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের তিনটি পর্যায়কে ‘প্রেম নিত্য’ (বাল্যলীলা), অনিত্য সংসার (মধ্যলীলা) ও ‘প্রভু কার হাতে তোমার রক্ত’ (অন্ত্যলীলা) নিয়ে লেখা ‘জ্যোতির্ময় শ্রী চৈতন্য’।

বিচিত্রের সন্ধান অর্থাৎ হঠাৎ করে বেরিয়ে পড়া। ‘হারায়ে সেই মানুষে’ কালকূটের ঠিক এমনই এক রচনা। “দেশ থেকে দেশান্তরে তিনি পাড়ি দিয়েছেন- ডেকেছে তাঁকে পাহাড়, ডেকেছে সমুদ্র, নদী। গহনে অথবা গহীনে- জটিল অরণ্যে বা মানুষের মেলায় তিনি ছুটে গেছেন। পথ তাকে বার বার বাউলের একতারা বাজিয়ে ডাক দিয়েছে- তিনি অধীর পথ পাগল পথিকের মতো ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন- আরেক চাবি দিয়ে খুলেছেন আরেক দরজা। নিয়ে চলে গেছেন অন্য জগতে। কিন্তু সে সবই দেশ থেকে দেশে যাত্রা- এ-গাঁ থেকে ভিন গাঁয়ে চলা। ‘হারায়ে সেই মানুষে সেই দিক থেকে বলা যায় কাল থেকে হারিয়ে যাওয়া অন্য এক কালের যাত্রা।”[২৩] (বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা: ঘ) পশ্চিমবঙ্গের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে এক শিশুবেলার ঘটনা প্রৌঢ়কালে স্মৃতি চারিত হয়েছে ‘মন মেরামতের আশায়’। যেখানে রুক্ষ মাটির রিক্ত স্থানে মানুষের জীবন সঙ্কটের রোজনামচা লেখকের কলমে ফুটে ওঠে।

বাংলা সাহিত্যে অরণ্যের চেতনা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কালকূটকে আকর্ষণ করেছে। সে অর্থে অরণ্য কেন্দ্রিক রচনায় কালকূটকে কিন্তু বিভূতিভূষণের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলা যাবে না। তবে কালকূট লিখেছেন তিনটি উপন্যাস, অরণ্যকে উপজীব্য করে। ‘মন চলে বনে’, ‘বনের সঙ্গে খেলা’ এবং ‘প্রেম নামে বন’- এই তিনটি রচনাকে ট্রিলজিও বলা চলে। এই ট্রিলজি উৎসর্গ করেছেন, ‘স্বর্গতঃ বিভূতিভূষণে বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে- যাঁর পদচিহ্ন ধরে বনের মনকে স্পর্শ করতে চেয়েছি।’ ষাটের দশক, বিহার উড়িষ্যার বর্ডার এলাকা। বন্ধু রাম বসুর সঙ্গে গিয়েছেন জরাইকেলায়। সেখানে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরা। জঙ্গলের অধিবাসীদের সঙ্গে থাকার অভিজ্ঞতা লেখক অর্জন করেছেন। শহুরে বা গ্রামের থেকে অরণ্যের জীবনযাত্রা কোথায় কতটা পৃথক, আচার বিচার সংস্কারে তারা কতটা বিশ্বাসী! তিপু, সুরসতিয়া ও তৃপ্তি ভৌমিকের সান্নিধ্যে কালকূটের কলমে জরাইকেলা, এদেলবা ও থলকোবাদের পটভূমিতেই রচিত হয়েছে এই ট্রিলজি।

পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত কালকূটের যে যাত্রা (মানস ভ্রমণ) সেখানে তিনি শুধু মানুষকেই দেখে গিয়েছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে গিয়েছেন। বাদ পড়েনি কোথাও! অরণ্য, পাহাড়, নদী, সমুদ্র। এমনকি কল্পনার মাধ্যমে পুরাণপথেও হাঁটা দিয়েছেন। কালকূট জানাচ্ছেন, “তত্ত্বতালাস যা কিছু মানুষকে চাই। যে-কালে সজ্ঞানে পথে বেরিয়েছিলাম, মানুষ ছিল আমার লক্ষ্য। কারণ, মানুষেরই সৃষ্ট একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে যখন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, তখন অন্য মানুষের সন্ধানে মন ব্যাকুল হয়েছিল। তার সঙ্গে অবিশ্যিই নিসর্গ, ভৌগলিক পরিবর্তনের প্রকৃতির বিস্ময়কর খেয়াল, ইতিহাসের ভাঙাগড়ার বিচিত্র ঘটনাবলী আমার আশ্রয়”।[২৪] (কালকূট, পৃষ্ঠা: ৩২৩৯) ‘কালকূট রচনা সমগ্রে’ উত্তম পুরুষে বর্ণিত কথাকার কালকূট নিজেই একটি চরিত্রে পরিণত হয়েছেন পাঠক তার পঠনের বিভোরতায় সেইটে খেয়ালই করেননি। রাজনীতির যে কলুষতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কালকূটের উদ্ভব হয়েছিল সেখানে কালকূট নামের রচনাগুলি যেন শুধু নিজেকেই খুঁজে পেতে সচেষ্ট হয়েছে। ‘জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু/ নয়ন না তিরপিত ভেল’ বিদ্যাপতির এই পদের মাধুর্য ফুটে উঠেছে কালকূট মানসে। সমরেশ থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে নিজস্ব এক জগত সৃষ্টি করলেন কালকূট। যে জগতে এক অন্তরঙ্গ জীবনবোধ আছে। বাংলা সাহিত্যের দরবারে তাই সমরেশের থেকে কালকূট বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তাঁর সরল

মন, গরলহীন চোখ মন কেড়েছে। কালকূট কালের পথিক, তাই তো সহজ সরল অনাড়ম্বর এক জীবনপথের পথিক হতে পেরেছে। যাত্রাপথে ক্লান্তির নিশান উড়িয়ে কালকূট বলেছেন,

> *"মেঘ যায় গলতে, ঝর ঝর ঝরতে। আমি যাই সুধার সন্ধানে। তীব্র বিষ আমার নাম -কালকূট। গরল আমার ধমনীতে। সেই কবিতার মতো বলতে ইচ্ছে করে, 'চির সুখিজন ভ্রমে কি কখন/ ব্যথীর বেদনা বুঝিতে পারে?/ কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে/ কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?' আমার দৌড়ঝাঁপ ছুটোছুটি যাই বল, সেই কারণে। মরি যে। জ্বলি যে। তাই আমি ভ্রমি সুধার সন্ধানে। বাঁচতে কে না চায়? মানুষ তো বহুত দূর, ওটা জীবের ধর্ম। হতে পারি কালকূট। তা বলে অমৃতের সন্ধানে যাবো না। এই আকণ্ঠ বিষ নিয়ে বাঁচব কেমন করে?"[২৫] (কালকূট, পৃষ্ঠা: ৩৫৩৭)*

তথ্যসূত্র:

১। গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, 'কালকূটকে নিয়ে কয়েকটি কথা', 'শব্দ সাহিত্য পত্রিকা', সম্পা, সাধনা বড়ুয়া, কালকূট বিশেষ সংখ্যা, ৩য় বর্ষ, ৩য় জানুয়ারী, ২০১১, পৃ, ১।

২। চৌধুরী, সত্যজিৎ, 'কালকূট-সমরেশ: দ্বৈতাদ্বৈত', 'সমরেশ বসু: আমাদের বাস্তব', কলকাতা: একুশ শতক, জানুয়ারী ২০১৩ পৃ, ১৮।

৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'প্রসঙ্গ সমরেশ: একটি সাক্ষাৎকার', অপরাজিত সাহিত্য পত্রিকা, সমরেশ বসু সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৮৮, পৃ, ১৯।

৪। কালকূট, 'গাহে অচিন পাখি', সম্পা, নিতাই বসু, 'কালকূট রচনা সমগ্র' প্রথম খণ্ড, কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ, ৩৯।

৫। তদেব, পৃ, ৪০।

৬। তদেব, পৃ, ৪০-৪১।

৭। বসু, সমরেশ, অশনি সাহিত্য পত্রিকা, জানুয়ারি সংখ্যা, ১৯৮৫।

৮। কালকূট, 'গাহে অচিন পাখি', সম্পা, নিতাই বসু, 'কালকূট রচনা সমগ্র', প্রথম খণ্ড, কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ, ৪০।

৯। তদেব, পৃ, ৪৮।

১০। তদেব, পৃ, ৪৮।

১১। তদেব, পৃ, ৪৯।

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'কালকূটের রচনাশৈলী', সম্পা, সাগরময় ঘোষ, 'কালকূট রচনা সমগ্র', প্রথম খণ্ড, কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃ, ঘ,

১৩। কালকূট, 'বিচিত্র', 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে', কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ১৪১৫, পৃষ্ঠা: ৭।

১৪। তদেব, পৃ, ১২।

১৫। তদেব, পৃ, ১২-১৩।

১৬। কালকূট, 'গাহে অচিন পাখি', সম্পা, নিতাই বসু, 'কালকূট রচনা সমগ্র' প্রথম খণ্ড, কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ, ৩৯।

১৭। কালকূট, 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়', সম্পা, নিতাই বসু, 'কালকূট রচনা সমগ্র', তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ, ১৩৭৬।

১৮। কালকূট, 'মুক্ত বেণীর উজানে', সম্পা, নিতাই বসু, 'কালকূট রচনা সমগ্র', পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ, ২২৫৪।

১৯। কালকূট, 'মুক্ত বেণীর উজানে', সম্পা, নিতাই বসু, 'কালকূট রচনা সমগ্র', পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ, ২৩৪৫।

২০। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'ভূমিকা', সম্পা, সাগরময় ঘোষ, 'কালকূট রচনা সমগ্র', দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৭৬, পৃ, খ।

২১। বসু, নিতাই, 'আসক্তিবিহীন উদাসীনঃ কালকূট', 'শব্দ সাহিত্য পত্রিকা', সম্পা, সাধনা বড়ুয়া, কালকূট বিশেষ সংখ্যা, ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৩য় জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা: ৩।

২২। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'ভূমিকা', সম্পা, সাগরময় ঘোষ, 'কালকূট রচনা সমগ্র', তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৭৬, পৃ, ক,

২৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ, 'ভূমিকা', সম্পা, সাগরময় ঘোষ, 'কালকূট রচনা সমগ্র', তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, ১৯৭৬, পৃ, ঘ,

২৪। কালকূট, 'অতিথি', সম্পা, নিতাই বসু, কালকূট রচনা সমগ্র, সপ্তম খণ্ড, কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃষ্ঠা: ৩২৩৯।

২৫। কালকূট, 'কালকূটের চোখে সমরেশ বসু', সম্পা, নিতাই বসু, কালকূট রচনা সমগ্র, অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃষ্ঠা: ৩৫৩৭।

গ্রন্থঋণ:

১। কালকূট, সম্পা, নিতাই বসু, কালকূট রচনা সমগ্র, প্রথম-অষ্টম খণ্ড, কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯।

২। রায়চৌধুরী, ঝুমা, 'কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসু: সামগ্রিক মূল্যায়ন', প্রথম খণ্ড, কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০০৭,

৩। রায়চৌধুরী, ঝুমা, 'কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসু: সামগ্রিক মূল্যায়ন', দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স, ২০০৭,

৪। চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ, 'কালকূট সাহিত্যের সন্ধানে', কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১৪,

৫। চক্রবর্তী, বারিদবরণ, 'সমরেশ বসু: জীবন ও সাহিত্য', কলকাতা: শিলালিপি, ২০০৬,

৬। চৌধুরী, সত্যজিৎ, (সম্পা,) অন্যান্য, 'সমরেশ বসু: স্মরণ সমীক্ষণ', কলকাতা: চয়নিকা, ১৯৯৪।